অশান দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা ২০০৩

বাংলায় নবজাগরণের সঙ্গতি অসঙ্গতিতে বিদ্যাসাগর

অশোক সেন

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

বাংলায় নবজাগরণের সঙ্গতি অসঙ্গতিতে বিদ্যাসাগর

অশোক সেন

ইতিহাসের লেখাপড়া, অনুসন্ধান, গবেষণায় নিবিষ্ট সকলেরই অশীন দাশগুপ্ত কে মনে আছে, থাকবেও নিশ্চয়। ইতিহাস বিদ্যার জগতে আমি কিছুটা বহিরাগতের মতো। অর্থনীতিতে কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে ইতিহাসে উত্তর খুঁজেছি। সেখান থেকে সমাজবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি - বিদ্যার অন্য শাখাপ্রশাখাতেও ঘুরতে হয়েছে। সে দিক থেকে যাকে বলে 'ইতিহাসের পন্ডিত' আমি ঠিক তা নই। তবু অশীনের স্মৃতিতে চিহ্নিত এই বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। একটা কষ্ট কিন্তু মনকে আচ্ছন্ন করে। মৃত্যু সব সময়েই দুঃখের। বয়সে আমি অশীনের বড়। তাই আমার দুঃখ আরও বেশি। অশীনের চিন্তার ঐশ্বর্য, গবেষণার মনীষা তার লেখায় আছে, চিরদিন থাকবে। সে আর আমাদের মধ্যে নেই, নেই সেই উষ্ণ হৃদয়, বুদ্ধিমান, তীক্ষ্ণ উইট-এ উজ্জ্বল মানুষটি। সেখানে শুধু এক মর্মান্তিক শূণ্যতা।

*

আমার বক্তব্যের বিষয় 'বাংলায় নবজাগরণের সঙ্গতি অসঙ্গতিতে বিদ্যাসাগর'। নবজাগরণ কথাটিতে ইংরেজি রেনেসান্স শব্দটি অনুবাদে তুলে আনার আভাস রয়েছে। তাই গোড়াতেই দু-চারটি ব্যাপার বলে নেওয়া ভাল। ধ্রুপদী পুরাকাল, অন্ধকারে আবৃত মধ্যযুগ (সামন্ততন্ত্র), রেনেসান্স, এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট, শিল্পবিপ্লব (ধনতন্ত্র), সমাজতন্ত্র ইত্যাদির পারম্পর্যে গ্রথিত ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতি ইউরোপের বাইরে ঠিক চোখে পড়ে না। আর ইউরোপের দেশে দেশেও ইতিহাসের গতিপথ এক ধাঁচে বাঁধা থাকেনি। তবে ওই মহা আখ্যানের (Grand narrative) বিরুদ্ধে উত্তর আধুনিক বয়ানে মার্ক্সবাদী (Marxist) চিন্তাভাবনাকে সমালোচনার আগ্রহে মার্ক্সীয় (Marxian) তত্ত্ববিশ্বকে নস্যাৎ করবার উৎসাহ আমার নেই। যতদূর জানি দেশে দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতির বোঝাপড়ায় অনড় এবং ইতিহাসমন্য দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োগে কোনো নির্বিশেষ গতিপথের (*marche generale*) হদিস দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন কার্ল মার্ক্স। এখানে 'নবজাগরণ' কথাটিতে তেমন কোনো নির্বিশেষের সংকেত নেই।

গত শতাব্দীর নতুন গবেষণা ও বিশ্লেষণে ইউরোপের রেনেসান্স সম্পর্কে আগেকার

ধারণার বেশ কিছু রদবদল হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে সেই চেনাজানা আমাদের মনে রাখা ভাল। রেনেসান্সের প্রথম আলোড়ন ইটালিতে। তখন সেখানে সমাজরাজনীতির কাঠামো বলতে অনেক নগররাষ্ট্রের সমাবেশ, যেমন ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস, নেপলস্, পোপের এক্তিয়ারে রোম প্রভৃতি। তার মধ্যে প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র দু-রকম ব্যবস্থাই ছিল। ইটালির মূল ভূখন্ডের বাইরে তার ভৌগলিক সীমার অন্তর্ভুক্ত সিসিলি, সার্দিনিয়ার মতো দ্বীপে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের নিদর্শনও উল্লেখযোগ্য। আর নাম যাই হক, রাষ্ট্রের শাসন এবং পরিচালনায় জনজীবনে প্রচলিত সব প্রথা, রীতিনীতির অনুগত থাকাই ছিল কেতা। উনিশ শতকে বুর্কহার্ট এবং তারপর ওল্ফ্লীন - এর বিশ্লেষণে চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের প্রাধান্য নিয়ে আপত্তির কারণ নেই। তেমন অবলম্বনে তাঁরা এক সর্বব্যাপী মানবতাবাদের (humanism) পরিচয় পেলেন। তুলনায় মধ্যযুগের সমাজ সংস্কৃতিকে মনে হয় ধর্মভীরু, অবরুদ্ধ এবং অবদমিত! তাই চৌদ্দ থেকে সতেরো শতকের ইতিহাস প্রাচীন গ্রীসরোমের প্রভাবে অনুপ্রাণিত মনে হয়। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে মীমাংসার ব্যাপারে বুর্কহার্ট অবশ্য সন্দেহাকুল ছিলেন।

পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেল ধ্রুপদী অতীতকে মধ্যযুগ ঠিক উৎখাত করেনি। মধ্যযুগকে নিছক তমসাচ্ছন্ন মনে করার কারণ নেই। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা অবধি ইটালির নগররাষ্ট্রগুলিতে রেনেসান্সের প্রস্তুতি পর্ব চনমনে অর্থনীতি, সমাজ রাজনীতি এবং জনবৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতিতে জড়িত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নাগরিক সঙ্ঘের (commune) আওতায় পৌর আদর্শের পরিপোষণ বিনা উত্তরকালীন বিকাশে মানবতাবাদের স্বাক্ষর মিলত কিনা সন্দেহ। জনজীবনের হাসিকান্না, সুখ দুঃখ, উৎসাহউদ্দীপনা থেকে উৎসারিত হয়েছিল এক সাংস্কৃতিক রূপান্তরের আবেগ এবং সামর্থ্য। পঞ্চদশ, ষোড়ষ শতাব্দীতে স্থাপত্য ও চিত্রকলায় যে যুগান্ত এল, তার পটভূমিতে ওই সুদীর্ঘ লোকায়ত ভাঙাগড়ার অমূল্য ভূমিকা ছিল। তা আদৌ কেবল কোনো গ্রীক লাতিন আধিপত্যের ব্যাপার নয়। অজস্র স্থাপত্যকর্মের উদ্যোগে, বিরাট সব শিল্পসৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতায় রেনেসান্স তুঙ্গে পৌঁছল নিশ্চয়। আর সেই ক্রিয়াপ্রক্রিয়ায় উচ্চশ্রেনীর অর্থবল তো অপরিহার্য। তবে আগেকার কয়েক শতাব্দী ব্যেপে ইটালিয় নগররাষ্ট্র সমূহের তৃণমূল স্তরে প্রত্যক্ষদর্শী, বস্তুভাবাপন্ন সব কাজকর্মের পরম্পরাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যবসাবাণিজ্য থেকে কাব্যচর্চা, বস্তুনিষ্ঠ চিত্রকলা থেকে কার্নিভালে প্রতিবাদ ও স্ফূর্তির একাকার প্রকাশ সর্বত্র তার চিহ্ন ছিল।

এসব কথার জের টেনে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। মানব আত্মা ও ঐশ্বরিক করুণার রহস্য অন্বেষণে মহাকবি দান্তে লোকায়তের দৈনন্দিন আঙিনায় বিস্তৃত সব জীবনধর্মী কথকতা থেকে আপন যাত্রাপথের প্রেরণা ও আস্থা অর্জন করেন। ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তি তথা এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট - এর অন্যতম নায়ক ভলতেয়ার - এর কাছে তা মনে হয়েছিল বর্বর ভাষা ও অপরিশীলিত চিন্তার দৃষ্টান্ত। তবে কি রবীন্দ্রনাথের 'যে আছে মাটির কাছাকাছি'— তেমন নিরিখে স্কলাস্টিক, রেনেসান্স, এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট - এর ভাবাদর্শ নিয়ে টানাপড়েন সম্পর্কে আমাদের অনেক নিরুত্তর জিজ্ঞাসা থেকে যায়।

ইউরোপীয় রেনেসান্স সম্পর্কে বোঝাপড়ায় আমি এক স্তরে বাখ্‌তিন এবং অন্য স্তরে ফুকোর বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করি। আর গ্রামশির 'নিষ্ক্রিয় বিপ্লব'-এর ভাবনা আমার সামান্য সাধ্যমতো চিন্তার এক বড় অবলম্বন। তবে অ্যালথুসার-এর ইতিহাসবাদ (historicism) বিরোধিতায় বিজ্ঞান বিজ্ঞান বাড়াবাড়ি আমার অপছন্দ হলেও তাঁর লেখা থেকেও কিছু শিখেছি। আর যে সব বইয়ের কাছে আমি বিশেষ ঋণী তার মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য ফ্রেডেরিকো শ্যাবোর 'মেকিয়াভেল্লি অ্যান্ড দ্য রেনেসান্স' এবং ল্যারো মার্তিনেস - এর 'পাওয়ার অ্যান্ড ইমাজিনেশন'। বলা উচিত অনেক আগে পড়া টিল্‌ইয়ার্ড-এর 'দ্য এলিজাবেথান ওয়ার্ল্ড পিকচার' বইটিও আমার স্মৃতিতে এক অমূল্য সঞ্চয়।

রেনেসান্স, এন্‌লাইটেনমেন্ট - এর পরিক্রমায় জড়িত বিজ্ঞান ও মানবতাবাদের অঙ্গীকার - এমন ধারণা আমাদের বিশেষ পরিচিত। যথাযথ গাণিতিক পরিমাপ এবং পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ মারফত বস্তুজ্ঞান অর্জনের অগ্রগতিতে পাঁচ ছ'শো বছরের ইতিহাস কত কীর্তিতে সমৃদ্ধ হলো তার ইয়ত্তা নেই। আজও তার নিত্যনতুন আবিষ্কার উদ্ভাবনে কত কিছুই না সম্ভব হচ্ছে। আবার প্রকৃতিকে ভোগদখল করতে গিয়ে তাকে বিষিয়ে তোলার বিপদও গোটা সভ্যতার কাছেই এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। বলতে হয় রেনেসান্সের আরম্ভে অন্য এক দিগ্বিজয়ের কথা। সেখানে শুরু হচ্ছে বিশ্বের ওপর নির্ভর ইউরোপের জীবনযাত্রা। তার পরিণামে এল বিশ্বজোড়া কর্তৃত্বে সাম্রাজ্যের সংস্থাপনা। ভুলবার নয় সামুদ্রিক অভিযানে অসমসাহসী বেপরোয়া ড্রেক, হকিন্স, কলাম্বাস, ভাস্কো দ্য গামারাও রেনেসান্সের অগ্রগণ্য নায়ক। সে সব কাজকর্মে বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তির মধ্যে স্পষ্ট কোনো প্রভেদ ছিল না। বিজ্ঞান ও মানবতাবাদের সঙ্গতি নিয়েও জটিলতা কম নয়। বলা যায় আনবিক বোমা তৈরিতে সাফল্যের সঙ্গে বুদ্ধের সহাস অনুমোদনের গরমিল চিরদিন নানাভাবে, নানারূপে চলছে।

মহাআখ্যানের বিশ্বজনীন প্রয়োগের সমস্যা আগেই বলেছি। সত্যি বলতে কি, টিউডর পর্ব এবং তার চূড়ান্ত মুহূর্তে রানী এলিজাবেথ-এর রাজত্বকালে শুরু করে ব্রিটেন-এর ইতিহাসে বণিকতন্ত্র (mercantilism) থেকে ধনতান্ত্রিক শিল্পবিপ্লবে পৌঁছবার যে ধারাবাহিকতা, তার কোনো দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত প্রায় নেই। একমাত্র হল্যান্ডের কথা যা বলা যায়। খোদ ইটালির ফ্লোরেন্সে এবং আর কয়েকটি নগররাষ্ট্রে গোড়াকার আশ্চর্য রমরমা সত্ত্বেও জাতীয় রাষ্ট্রের সংহতি এবং ধনতান্ত্রিক রূপান্তর অনেক বিলম্বিত হয়েছিল। এমন কি সেদেশে উনিশ শতকে রিসোর্জিমেন্তো (Risorgimento) -র বিশ্লেষণেও আন্তোনিও গ্রামশি 'নিষ্ক্রিয় বিপ্লব' (passive revolution) - এর পরিচয় পেলেন। অর্থাৎ সামন্ত স্বার্থের সঙ্গে রফা করে ধনতন্ত্রের বাঁকাচোরা চেহারা আর মন্থর গতি।

*

রেনেসান্সের ঐতিহাসিক বৈচিত্র্য নিয়ে এসব কথা বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল। কারণ এই নয় যে ইংরেজ শাসিত বাংলায় কোনো রেনেসান্সতুল্য সমাজ সংস্কৃতির আলোড়নে

বিদ্যাসাগর জড়িত ছিলেন। ইউরোপ সদৃশ রূপান্তরের পরিচয় আমাদের উনিশ বিশ শতকের ইতিহাসে নেই। তবু কী আছে, কী নেই বুঝতেও তো যার সঙ্গে তুলনা সে অভিজ্ঞতার বিচার বিবেচনা কত জটিল প্রশ্নে জড়িত তার মোটামুটি ধারণা থেকেই শুরু করতে হয়। যুক্তি ও ভক্তির অসম্পূর্ণ সমন্বয় থেকে মুক্ত নয় ইউরোপের রেনেসাঁস। রেনেসাঁসে তেমন মুক্তির ধারণায় ভ্রান্তির পরিচয় আছে। বস্তু ও জীবনের স্তরে স্তরে গ্রথিত শৃঙ্খলার মানবিক আস্থা বাদ দিয়ে কেবল কার্যকারণে বাঁধা প্রকৃতিকে বশীভূত করাটাই বিজ্ঞানের মাপকাঠি হতে পারে না। ভক্তির প্রয়োজন নিছক ভগবৎ বিশ্বাসের অনুবর্তনেই আসে না। নিখিল বিশ্বচরাচর সম্বন্ধে সর্বব্যাপী শৃঙ্খলার উপাত্ত ব্যতিরেকে যুক্তির মুক্তিও সম্ভব নয়। মধ্যযুগে মানুষের জ্ঞান ও কর্মে নীতিময় ঐক্যের প্রশ্ন অতিপ্রাকৃত বিধানের ঐশ্বরিক প্রতিপত্তিতে উত্তর খুঁজে ফিরত। রেনেসাঁসোত্তর বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় বাস্তবতার বিভিন্ন স্তরের নিয়ম পাশ্চাত্যের মানুষ নতুন করে বুঝল। সেই জ্ঞানের আলোয় প্রাক্তন শৃঙ্খলায় আস্থা বজায় থাকে না। কয়েক শতাব্দী ধরে ভক্তি ও যুক্তির নানা অসম্পূর্ণ সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই চলে বুর্জোয়া বিবর্তনের বিরাট ও জটিল অভিজ্ঞতার পুঞ্জীকরণ।

বাংলায় নবজাগরণের বাড়তি সমস্যা ছিল তার যুক্তির কর্মকাণ্ড বা ভক্তির প্রয়োজন দেশজ মনের অভ্যস্ত সমগ্রতা থেকে, সর্বগ কোনো ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে উত্থিত হয়নি। শতাধিক বর্ষব্যাপী নবাবি অবক্ষয়ের জের ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক শাসনের প্রথম পর্বে নিছক বাণিজ্যের নামে অবাধ লুণ্ঠন এদেশের পক্ষে ছিল এক নির্মম দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা। তারপরে যখন ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবোত্তর ধনতান্ত্রিক যুগান্তের প্রেরণায় এখানে ধাপে ধাপে বিধিবদ্ধ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা স্থাপিত হলো, সেই পরাধীন বন্দোবস্তের ওপর নির্ভরতায় আমাদের আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম ও বিকাশ ঘটে। জমিদার, আমলা, উকিল, মোক্তার, মাস্টার, কেরাণী জীবনের মধ্যবিত্ত অবলম্বনে সেই বন্দোবস্তের বহুতর প্রকাশ। মধ্যবিত্ত জীবনের নতুন সুযোগের সঙ্গে ইংরেজি জ্ঞানের প্রসাদ জড়িয়ে ছিল। তেমন প্রসাদের পটভূমি ছিল দেশব্যাপী এক চিরস্থায়ী উপবাসের অন্ধকার। কিন্তু জীবন ও জীবিকার বাধ্যবাধকতায় নব্য মধ্যবিত্তের কাছে আলোর সুযোগটুকু বড় হয়ে দেখা দেয়। তার গ্রহণ ও ব্যবহারের প্রয়োজন তাই তাঁদের কর্মকান্ডে অগ্রাধিকার পেয়ে গেল।

পরাধীন মধ্যবিত্ত জীবনের নড়বড়ে ভিৎ-এর ওপর দাঁড়িয়ে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় শুরু হলো। নতুন মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার প্রকরণে ধর্মবিশ্বাস ও ভাবাদর্শকে আর ঠিক প্রাক্তন সামঞ্জস্যের প্রত্যয়ে মেলানো চলে না। আচারমুক্ত ধর্মের আবশ্যকতা মধ্যবিত্ত জীবনের ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্র বিন্যাসের সঙ্গে, বিজিতের পক্ষে বিজয়ীর অনুকরণে সভ্য হওয়ার আগ্রহে জড়িয়ে যায়। ইংরেজপূর্ব সম্পত্তির ধারণায়, তার ব্যবহারের ন্যায়সঙ্গতিতে সমষ্টিগত উদ্দেশ্যের ব্যাপারটা আদর্শ হিসাবে জরুরি ছিল। তখন বহু দেবদেবীর জন্য ব্যয়বাহুল্যের, বারো মাসে তেরো পার্বণের একটা সামাজিক তাৎপর্য থাকত। যে সামাজিক সংগঠন তেমন তাৎপর্যের উৎস, ইংরেজোত্তর অর্থনৈতিক প্রবর্তনায় তার

গোড়ায় কোপ পড়ল। তারপর নববাবু পর্যায়ের উৎকট বিলাসব্যসন কোনো সামাজিক সদর্থে চিহ্নিত ছিল না, আর তার অনাচার, অপচয়ের অজস্র প্রমাণ ভবানীচরণ, টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্নর রচনায় ছড়িয়ে আছে। আবার নতুন শিক্ষায় আপ্লুত তরুণদের মধ্যে দেশীয় আত্মসত্তা বিসর্জন দেওয়ার যে ঝোঁক দেখা যায় তাতেও বিপদের আশঙ্কা ছিল। এরকম উভয় সংকটের পটভূমিতে রামমোহনের কীর্তি, নব্য মধ্যবিত্ত সভ্যতার উপযুক্ত ধর্মবিশ্লেষণ ও সমাজ সংস্কারের প্রয়াস আমাদের স্মরণীয়। তাঁর ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা ও আদর্শ বিন্যাস নব্য মধ্যবিত্ত ইহলোকের সীমা থেকে উত্থিত আধ্যাত্মিক প্রকল্পের অনুশীলনে কালোচিত চৈতন্যের সক্রিয়তাই প্রমাণ করে।

যে মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের কথা বলছি, তাঁদের মধ্যে অনেক স্তরভেদ ছিল। ১৮২৩ -এ প্রকাশিত 'কলিকাতা কমলালয়' বইতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আয়বৈষম্যের ভিত্তিতে স্তরভেদের বিবরণ দেন। তাঁর ভেদাভেদে অভিজাত মধ্যবিত্ত, গৃহস্থ মধ্যবিত্ত এবং গরিব মধ্যবিত্ত ('দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক'), এই তিনটি স্তরের কথা ছিল। মেকলের শিক্ষানীতির প্রবর্তন আর সরকারি চাকরিতে এদেশীয়দের সুযোগ বাড়লে স্তরভেদের বৈচিত্র্য বাড়তে থাকে। ধনীদরিদ্র যাই হন, কোনো স্তরেই এঁরা জিনিসপত্রের সামাজিক উৎপাদনে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নন, অর্থাৎ ভূমিস্বত্ব, আমলা, উকিল, করণিক অর্থাৎ জমি থেকে খাজনা এবং পরিষেবা (সার্ভিস) তথা প্রধানত অর্থনৈতিক কর্মবিভাগের তৃতীয় প্রকরণের (tertiary sector) ওপর নির্ভরতায় গড়ে উঠেছিল বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবিকা ও জীবনযাত্রা। গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় পরম্পরাতেই সংস্কৃত পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাপনার কাজ প্রধান ছিল। নিদারুণ দারিদ্র্যের চাপে তাঁর বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বংশানুক্রমিক বৃত্তিতে থাকতে পারেন নি। গ্রাম ছেড়ে জীবিকার খোঁজে তিনি কলকাতায় আসতে বাধ্য হন এবং যৎসামান্য ইংরেজি শিখে সওদাগরি হাউসে নিতান্ত অল্পবেতনের কাজে যোগ দেন। ১৮২৮ এ আট বছরের ইশ্বরচন্দ্র তাঁর বাবার সঙ্গে কলকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্য এলেন। তখন ঠাকুরদাসের মাসিক রোজগার দশ টাকা।

গ্রামের পাঠশালার মাস্টারমশাই বালক ঈশ্বরচন্দ্রে মেধা ও বিদ্যার্জনের আগ্রহে চমৎকৃত হয়ে ঠাকুরদাসকে বলেন যে ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। তখন হিন্দু কলেজে মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। ঠাকুরদাসের আর্থিক অবস্থায় পুত্রকে সেখানে ভর্তি করা অসম্ভব। তদুপরি নিজে বংশানুক্রমিক বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ঠাকুরদাসের মনে ক্ষোভ ছিল। তাঁর ইচ্ছা ঈশ্বরচন্দ্র উপযুক্ত সংস্কৃত শিক্ষা করে আবার নিজে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করুন। সংস্কৃত কলেজে ছেলেকে ভর্তি করলেন ঠাকুরদাস। সেখানে শিক্ষার্থী ঈশ্বরচন্দ্র তো নিতান্তই এক অন্তেবাসী গ্রাম্য বালক। অসামান্য মেধা, কঠোর পরিশ্রম আর সুদৃঢ় শৃঙ্খলায় অনুপ্রাণিত বিরাট সাফল্যময় ছাত্রজীবন থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের স্বীকৃতি ও গৌরবের সূচনা। জন্মসূত্রে যা তাঁর ছিল না, স্বীয় কীর্তিতে তিনি তা অর্জন করলেন।

নবজাগরণের সঙ্গতি অসঙ্গতির কথায় বলতে হয় ইংরেজি বিদ্যার্জনের সংগঠিত প্রতিষ্ঠানে যে নতুন মূলধারার শিক্ষাবস্তু ও প্রণালী তখন গড়ে উঠছে, শিগগিরই যার বিধিবদ্ধ প্রণয়ন ও অভ্যর্থনায় মেকলের ভূমিকা সুবিদিত, ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন তো তার বাইরেই কেটে যায়। ইংরেজি শিক্ষার সামান্য যেটুকু সুযোগ সংস্কৃত কলেজে ছিল তাও ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় নাকচ হয়। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা হিন্দু কলেজে মাইনে দিয়ে পড়ে, অন্যদিকে সংস্কৃত কলেজে জলপানি দিয়ে ছাত্র জোটাতে হয়। এমন ব্যবধান সম্পর্কে মেকলে-নীতির অন্যতম প্রবক্তা ট্রেভেলিয়ন্ অবজ্ঞায় ভরা মন্তব্য করেন যে ভাড়াকরা ছাত্রদের নিয়ে সংস্কৃত কলেজ চালিয়ে যাওয়া কত নিরর্থক!

এহেন ভাড়া করা ছাত্রদের কলেজেই তো লেখাপড়া করেন ঈশ্বরচন্দ্র। বাল্যকৈশোর থেকে যৌবন ছোঁয়া পর্যন্ত এগারো বারো বছরে ব্যাপ্ত তাঁর ছাত্রজীবন। নিজের কলেজ থেকে খুবই কাছে একই হাতার মধ্যে দেখা শোনার গণ্ডিতে হিন্দু কলেজ। সেখানে বড়ঘরের ছেলেদের গাড়িঘোড়া, আনাগোনা, হালচাল, আদবকায়দা নিশ্চয় ঈশ্বরচন্দ্রের চোখে পড়ত। কী ভাবতেন জানলে হয়তো আমরা তাঁকে আরও বুঝবার সুযোগ পেতাম। কিংবা ধরুন জীবনে প্রথম চাকরিতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পন্ডিত (সেরিস্তাদার) বিদ্যাসাগর সাহেবদের কাছাকাছি এসেছেন। সেই যোগাযোগে তাঁর ইংরেজি শেখার কাজও এগিয়েছে। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বন্ধুদের সাহায্যে বিদ্যাসাগরের ইংরেজি জ্ঞান পাকাপোক্ত হয়। ইংরেজি ও হিন্দি শেখার জন্য কিছুকাল মাস মাইনেতে দু-জন শিক্ষকও রেখেছিলেন বিদ্যাসাগর।

অন্য কথা বলতে গিয়ে ইংরেজি শেখার কথায় এসে পড়লাম। তেমন অন্য কথার ইঙ্গিত বিনয় ঘোষ দিয়েছিলেন। ১৮৪৩ এর ফেব্রুয়ারি মাস। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাইনের কাজ করছেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা, পরিশ্রম, সততায় সাহেবরাও খুশি। থাকেন বৌবাজারে হৃদয়রাম ব্যানার্জি লেনে ছোট ভাড়া বাড়িতে। অনেক পোষ্য। চাক্‌রি পাওয়ার পর নিজের বাবাকে আর কাজ করতে না দিয়ে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন বিদ্যাসাগর। সংসারের পুরো ভার বিদ্যাসাগরের ওপর। বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং-এর তখন যে বাড়ি তার পূর্বাংশে ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। আর মিশন রোতে অবস্থিত ওল্ড মিশন চার্চ।

সেখানে মধুসূদন দত্তের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা হলো। বাংলায় নবজাগরণের ইতিহাসে ওই ঘটনার তাৎপর্য নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। তার মধ্যে এখন ঢুকছি না। দীক্ষার দিন বৃহস্পতিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের খুবই কাছে ওল্ড মিশন চার্চ। বিকেলের দিকে ছুটির পর বিদ্যাসাগরের বাড়ি ফিরবার কথা, তখন তো দীক্ষার সময় হয়ে এল। ব্যাপারটি নিয়ে আগেপরে শহড় জুড়ে বাক্‌বিতন্ডা, উত্তেজনার অন্ত ছিল না। আর দীক্ষার দিন তো উৎসুক উত্তেজিত মানুষের ভিড়, গির্জার সামনে সশস্ত্র সৈনিকদের পাহারা, সাহেব সুবোদের গাড়ি ঘোড়ার সমাগম ইত্যাদি অনুষঙ্গে ভরে যায় গোটা অঞ্চল। মনে হয়

এমন পরিস্থিতিতে কী ছিল বিদ্যাসাগরের প্রতিক্রিয়া। কী ভাবছিলেন তিনি কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার মাইল খানেক হাঁটা পথে? বয়সে মধুসূদন বিদ্যাসাগরের থেকে বছর তিনেকের ছোট। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র সম্ভবত দেখে থাকবেন বৈভবমন্ডিত হিন্দু কলেজের দেদীপ্যমান ছাত্র মধুসূদনকে, শুনেও থাকবেন তাঁর দারুন প্রতিভার কথা। শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিতে, সমাজ সংস্কারে নিবিষ্ট তাঁর কর্মবহুল জীবনে বিদ্যাসাগর কখনও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হননি। এমন কথাও বলতেন যে 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও সব দল বাঁধা কান্ড'। বিদ্যাসাগর রচিত পাঠ্যপুস্তকের বিরোধিতায় খ্রিষ্টান ভার্নাকুলার বুক সোসাইটি'র রেভাঃ জন মার্ডক মন্তব্য করেন যে ওসব বই ছাত্রদের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাস এবং ধর্মভাব সৃষ্টির অনুকূল নয়। পরবর্তী জীবনে মধুসূদনের অভাবে আপদে সাহায্যদানে, তাঁর প্রতিভার অপচয় রুখতে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। তাই মধুসূদনের ধর্মান্তর এবং পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া আবার যে নামের কলেজে তিনি হেড পন্ডিত, সেই নামের দুর্গেই দীক্ষার আগে আশ্রয়ের দরুন প্রায় বন্দী হলেন মধুসূদন — এসব ঘটনায় কোন চিন্তায় তাড়িত হতেন বিদ্যাসাগর? তেমন চিন্তাই তো নবজাগরণের সঙ্গতি অসঙ্গতিতে আলোকপাত করতে পারে।

সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগরের নির্ভীক উদ্যোগ ও তৎপরতার কথা অনেকেই জানেন। এ'বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ ''বাল্যবিবাহের দোষ'' 'সর্বশুভকরী পত্রিকায়' ১৮৫০ এ প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তিনি শাস্ত্রবাক্যের তোয়াক্কা করেননি। 'স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায়' মুগ্ধতা নিয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের কাছে বিধবা বিবাহের প্রবর্তন ছিল 'জীবনের প্রধান সৎকর্ম'। বিধবা বিবাহের ঔচিত্য প্রমাণে তিনি অবশ্য শাস্ত্রীয় অনুমোদনকে গুরুত্ব দেন। গুরুতর কোনো সংস্কার সামাজিক সহমত বিনা সম্ভব নয়। শাস্ত্রীয় বিধান বহুজনের আস্থার আকর। বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব আগাগোড়া শাস্ত্রীয় অনুমোদনে চিহ্নিত। তাঁর প্রথম বইটি বেরুলে হিন্দুসমাজ ও পন্ডিত মহলের বহু প্রতিবাদ এবং বিরোধী মতামত প্রকাশ পেল। যে সব সূত্র ধরে প্রতিবাদ ও সমালোচনা হয়েছিল, দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর তেমন সব প্রমাণ খন্ডন করেন এবং নিজের প্রতিটি সিদ্ধান্তের পক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তি তুলে ধরেন। বাদপ্রতিবাদ, আন্দোলন আলোড়নে আকীর্ণ সেই পরিস্থিতি এবং পক্ষে বিপক্ষে সরকারের কাছে অনেক স্বাক্ষর সংবলিত আবেদন পেশ হতে থাকে। ১৮৫৬তে হিন্দুদের বিধবা বিবাহ অনুমোদন করে একটি সর্বভারতীয় আইন ব্যবস্থা পরিষদে প্রণীত হলো।

বিধবার হিন্দু বিবাহ সম্পাদনে প্রচলিত সব আচার ব্যবস্থা পালনের সমর্থক ছিলেন বিদ্যাসাগর। আইনের সিলেক্ট কমিটি পর্বে 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায় একটি আর্জি পেশ করে যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে রেজিস্ট্রি করলেও বিধবা বিবাহ বৈধ গণ্য হবে। এই অনুরোধ মঞ্জুর হয়নি। কমিটির মতে তেমন অনুমোদনে গোঁড়া হিন্দুদের ধর্মবোধ আঘাত পাবে এবং তার ফলে প্রস্তাবিত আইনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে। আইন প্রণয়নের প্রতি পদে বিদ্যাসাগরের পরামর্শকে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দেন। এখানে

উল্লেখযোগ্য একটি পরবর্তী অভিজ্ঞতা। ১৮৬০-৭০ এর দশকে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মদের আন্দোলন আর এক ধরনের বিধবা বিবাহে উদ্যোগী হয়েছিল। এ সব বিয়ের অনুষ্ঠানে হিন্দু আচারব্যবস্থা বর্জিত এবং অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অমত ও বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বিয়ে হয়েছিল। ১৮৭২ এর 'সিভিল ম্যারেজ' (তিন আইন) বিধি প্রণয়নে ওই তরুণ ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়। ইতিমধ্যে আবার বিদ্যাসাগর নিজের উদ্যোগে বিধবাবিবাহের প্রচেষ্টায় এতরকম ব্যর্থতা, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন যে তিনিও 'সিভিল ম্যারেজ' আইনের 'কিম্ভুতকিমাকার' শর্তটি বাদ দিলে তার সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী হন। সে আইনে বিবাহেচ্ছু পাত্রপাত্রীদের কবুল করতে হতো যে প্রতিষ্ঠিত কোনো ধর্মের বৈবাহিক নিয়মের তাঁরা অনুগত নন। এটাকেই বিদ্যাসাগর 'কিম্ভুতকিমাকার' বলেছিলেন। যাইহোক তা বাদ দিয়ে কোনো 'সিভিল ম্যারেজ' আইনের সুযোগ বিদ্যাসাগর পাননি। চারজন সাক্ষীর স্বাক্ষর সংবলিত এক টাকার স্ট্যাম্প কাগজে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে বিদ্যাসাগর প্রবঞ্চনা রোধের চেষ্টা করেন।

বিদ্যাসাগরের তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলা দরকার। হিন্দু সমাজে রক্ষণশীল স্বার্থের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আইন যদিবা প্রণীত হলো, সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের সাফল্য ছিল খুবই অকিঞ্চিৎকর। উদ্যোগে, প্ররোচনায়, অর্থব্যয়ে চেষ্টার ত্রুটি করেননি বিদ্যাসাগর। দেনায় জর্জরিত হন বিদ্যাসাগর। সালংকরা কন্যা সম্প্রদানে সংশ্লিষ্ট যৌতুকাদির ব্যয় তো ছিলই। তদুপরি দলবদ্ধ প্রতিরোধ, জমিদারের জুলুম ইত্যাদি নানারকম বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হতো এবং তার আনুষঙ্গিক জনবল সংগ্রহ, মামলামোকদ্দমায় প্রচুর খরচ হতো। এক সময় বিদ্যাসাগরের ধারের পরিমাণ ৮২,০০০ টাকা দাঁড়ায়। ১৮৬৭ সালে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় মান্যগণ্য ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত একটি আবেদন বের হয়। তাতে বিদ্যাসাগরের ঋণশোধের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। বিদ্যাসাগর কিন্তু সংশিষ্ট ভদ্রলোকেদের ওই আবেদন প্রত্যাহার করতে বলেন। এই মর্মে ২৬ জুলাই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর পত্রের বক্তব্য ছিল যে একটি জাতীয় উদ্দেশ্য (national object) সাধন ছিল তাঁর অভিপ্রায়, কিন্তু সেই সূত্রে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত ঋণের দায় এত জড়ানো হয়েছে বলে ওই আবেদনে তাঁর ঘোর আপত্তি। সব মিলে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় তিক্ত, বিপর্যস্ত বিদ্যাসাগর একটি চিঠিতে লেখেন, 'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না'।

'জাতীয়' কর্তব্যের লক্ষ্যে বিদ্যাসাগর নিবিষ্ট ছিলেন। গোড়ায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেকে তা রাখেন নি। প্রথম স্ত্রী বর্তমানেও অনেকে বিধবা বিবাহের পাত্র হতো। হিন্দু প্রথানুসারে বিয়ের যৌতুবাদি আদায় ছিল তাদের ফন্দি। বিয়ের পরে অনেক পাত্রের আর পাত্তা মিলত না। ফলে বিয়ের খরচ তো বটেই, বিবাহের পরেও নিঃসহায় কন্যার ভরণপোষণের দায় বিদ্যাসাগরের ওপর বর্তাত। এমন বঞ্চনার থেকে রেহাই পেতেই বিদ্যাসাগর উল্লিখিত অঙ্গীকারপত্রের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন।

নানা স্তরে ছড়িয়েছিল এসব অসঙ্গতির কার্যকারণ। আইনের প্রশ্নে খেয়াল রাখা উচিত যে ধর্মশাস্ত্র এবং ব্রিটিশ 'কমনল'-র সংমিশ্রনে নির্মিত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার জটিলতা। ওয়ারেন হেস্টিংস থেকেই তার আরম্ভ। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ব্যাপারে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র অথবা মুসলমানের শরিয়ত অবলম্বনেই হবে আইনবিধি। প্রাক্-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চলে, জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের নিজনিজ গন্ডিতে তাদের প্রথামতো লোকাচারের যে বিধান ছিল, 'কমনল' তে সে সব স্বতন্ত্র এক্তিয়ার ভাঙতে শুরু করে। এমন অবস্থায় যাকে বলতে পারি ইঙ্গ-হিন্দু আইন তাতে বিধবা বিবাহের প্রবর্তন ধর্মশাস্ত্রের অনুকূল ব্যাখ্যা ভিন্ন সম্ভব নয়। তাই রাজার আজ্ঞা এবং প্রজার সমর্থন উভয় উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রবিচারে নিহিত। আরও উল্লেখযোগ্য যে এই আইনে অনুমতির ক্ষেত্রে প্রসারিত হচ্ছে, তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অন্যপক্ষে বহুবিবাহ নিষেধ মানেতো একটা নিবারণের ব্যবস্থা যার থেকে বিচ্যুতি দণ্ডনীয় অপরাধ। সে ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণ, অনেক প্রচেষ্টা এবং বহুজনের আবেদন সত্ত্বেও কোনো আইন প্রণীত হয় নি।

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহের অনুমোদন ছিল বিদ্যাসাগরের মূল লক্ষ্য। হিন্দুদের জাতিভেদ এবং স্তরে স্তরে বিন্যস্ত উঁচুনিচু সমাজের গড়নে যে ভাবাদর্শের স্বীকৃতি, সমাজ সংস্কারের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে যান নি। উচ্চ এবং মধ্য বর্ণের পরম্পরাতেই ছিল বিধবা বিবাহের কঠোর বিরুদ্ধতা। কোনো কোনো মধ্যবর্তী বর্ণে আবার বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করা একরকম বর্ণাভিজাত্যের ব্যাপার হয়ে পড়ে। সমাজের ওই স্তরেই সনাতন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধতায় বিধবাবিবাহের প্রবর্তন ছিল সুদূরপরাহত। বিধবাবিবাহ হক বা না হক, তার সঙ্গে সাংসারিক বা সামাজিক শ্রমবিভাগে মেয়-পুরুষের অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। আবার বিয়ে না হলে বিধবার খাওয়াপরা আচার বিচারের শৃঙ্খল শিথিল করার কোনো প্রস্তাব বিদ্যাসাগরের ছিল না। শাস্ত্রীয় যুক্তির সীমায় তা সম্ভব নয়। তখনকার ভদ্রলোক সমাজে বিবাহই ছিল বাড়ন্ত মেয়েদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তার জন্য পণ ও যৌতুকের ব্যবস্থা কন্যার পিতা তথা অভিভাবকদের এক কঠিন, কষ্টসাধ্য দায়িত্ব। এই প্রসঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকদের কথা রিসলি লিখেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য যে উপযুক্ত জাতকুলে অনূঢ়া কন্যাদের বিবাহ এমনিতেই বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। পাত্রীর জোগানে বিধবাদের প্রবেশ ঘটলে সমস্যা আরও কঠিন হবে।

'অস্পৃশ্য' বহু বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। ১৮৫৬-র আইনের এক্তিয়ার তো পুরো ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ। একাধিক সমীক্ষায় দ্রষ্টব্য যে মোট হিন্দুর মধ্যে নিচুতলার শূদ্রবর্ণের লোক সত্তর আশি শতাংশ এবং তাদের লোকাচারে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। সেরকম অনেক বর্ণের ক্ষেত্রেই আবার বিবাহিতা বিধবা পূর্বতন স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারচ্যুত হতেন না। ১৮৫৬-র আইনে আবার বিবাহিতা বিধবা পূর্বতন স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হারাবেন। ফলে সে আইনের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রচলিত প্রথার অসঙ্গতি দেখা দিল। এলাহাবাদ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলকাতার নিম্ন ও উচ্চ

আদালতে অনেক মামলায় সেরকম ভেদাভেদের নজির পাওয়া যায়। ১৮৫৬-র আইনে বিয়ে না করলেও কোনো বিধবা অন্য পুরুষের ঘনিষ্ঠ হলে মৃত পতির সম্পত্তিতে অধিকার হারাবেন বলে কোনো বিধান ছিল না। থাকার কথাও নয়। 'অসতী' অভিযোগে একজন হিন্দু বিধবার মৃত পতির সম্পত্তিতে অধিকার চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা হয়েছিল। তা নিয়ে তখন খুব সোরগোল পড়ে। মামলার রায় মহিলার পক্ষে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগরকে কেউ প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দেন যে অসতী হওয়ার তিনি সমর্থক নন, কিন্তু একবার কাউকে সম্পত্তির অধিকার দিয়ে তা প্রত্যাহার করা সমীচীন নয়।

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে বিদ্যাসাগরের সাফল্য বেশি নয়। নতুন আইন মাফিক বিয়ের সংখ্যা কমই ছিল। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের স্বভাবজ পরহিতের আগ্রহ একটা সামাজিক প্রেরণায় সন্যস্ত হয়। নিজের পটভূমির ঊর্ধ্বে উঠতে চাইলেও বিদ্যাসাগর নিম্নবর্গীয় হিন্দু পরম্পরায় আত্মীয় হতে পারেন নি। ঘটনাচক্রের এমনই পরিহাস যে একটি বিধবাবিবাহ নিয়ে ভাইদের সঙ্গে মতভেদের দরুন বিদ্যাসাগর চিরদিনের জন্য আপনার গ্রাম বীরসিংহ পরিত্যাগ করেন। নিকটস্থ ক্ষীরপাই গ্রামের হালদার বাবুদের বিদ্যাসাগর কথা দেন যে ওই বিয়ে হবে না। পাত্র মুচীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় হালদার বাবুদের 'ভিক্ষাপুত্র' এবং তাঁদের গৃহদেবতার পূজারি ছিলেন। বিদ্যাসাগরের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর অনুজরা উদ্যোগী হয়ে রাতারাতি বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। যে বিদ্যাসাগর আত্মীয়দের বিরুদ্ধতার তোয়াক্কা না করে নিজের ছেলের বিধবাবিবাহ সাগ্রহে অনুমোদন করেন, উল্লিখিত মুচীরামের বিয়ের প্রতিক্রিয়ায় তিনিই আবার বীরসিংহ ত্যাগ করলেন। সংকল্পের দৃঢ়তায়, নির্ভীক নিরলস প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার প্রকল্পে এক অসামান্য ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় নিশ্চয় আমরা পাই। তবে মধ্যবিত্ত জীবনে সমাজ সংসারের যাবতীয় বিরুদ্ধতা তো আর কেবল ব্যক্তিবিশেষের দুর্দম প্রয়াসে অতিক্রম করা যায়না। বিধবাবিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে একটি মূল্যবান সমীক্ষায় বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে বিধবার প্রতিকূলে অবস্থিত কায়েমি স্বার্থের একটি তালিকা ছিল। তার মধ্যে আছে বিধবার সর্বস্ব গ্রাসে লোলুপ ধর্মগুরু, তীর্থস্থানের পান্ডা, বিধবার সম্পত্তি হাতিয়ে তাকে বিনা মাইনের দাসীর মতো খাটাতে ইচ্ছুক নিজের এবং স্বামীর ভাইবোনেরা, লম্পট জমিদার আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ। সমাজ সংসারের এত স্তরে পরিব্যাপ্ত সব বিরুদ্ধতার সঙ্গে সফল সংগ্রামের উপযুক্ত কোনো শক্তি উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রসমাজের ছিল না।

১৯৪৬ - এ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সহকারি সচিবের পদে নিযুক্ত হন। নিজে যেখানে আগাগোড়া ছাত্র ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবস্তু ও শিক্ষাপ্রণালীর বেশ কিছু সংস্কারে বিদ্যাসাগর উদ্যোগী হন। সচিব রসময় দত্ত ওই প্রস্তাব উপেক্ষা করলে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। চার বছর পরে তৎকালীন সরকারি শিক্ষা কাউনসিল - এর অনুরোধে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হন। তখন তাঁকে শিগগিরই অধ্যক্ষ পদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। অধ্যক্ষ হয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সাধনে মন

দিলেন। যে প্রস্তাব আগে রসময় দত্ত অগ্রাহ্য করেন তারই আরও পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগে সংস্কৃত কলেজের রূপান্তর হলো। প্রধান প্রধান পরিবর্তন হিসাবে উল্লেখযোগ্য ছাত্র শিক্ষকদের আসা যাওয়ায় নিয়মানুবর্তিতার ব্যবস্থা, ক্লাসে অধ্যাপকদের ঢিলেঢালা ভাবের অবসান, পঞ্জিকার কড়াকড়ির বদলে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন নির্ধারণ। আগে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যরা সংস্কৃত কলেজে পড়তে পারতেন। বিদ্যাসাগরের সুপারিশে কায়স্থরা পড়বার সুযোগ পেলেন। নিম্নস্থ শূদ্রবর্ণদের তেমন সুযোগ দিতে নিজের আপত্তি না থাকলেও, পন্ডিত সমাজ ও গোড়া হিন্দুদের বিরোধিতার দরুন বিদ্যাসাগর তা সুপারিশ করেননি। সরকারি আদেশে সেক্রেটারি, অ্যাসিস্টাস্ট সেক্রেটারির পদ বিলোপ করে অধক্ষের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল।

পাঠক্রমের পরিবর্তনে নতুন বিষয় গুরুত্ব পেল। সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা যুক্ত হলো। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে স্থান পায় ইংরেজিতে জ্ঞাতব্য ইতিহাস, গণিত এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান। আরও স্থির হলো নৈতিক ও মনোদর্শন, যুক্তিবিদ্যা এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি (political economy)-র মধ্যে অন্তত একটি বিষয় প্রতি বছর উচ্চতর বৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্য থাকবে। বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য মার্জিত, স্পষ্ট, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষার নির্মাণ, বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন আর বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত এক শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের সৃজন, যাঁরা দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিদ্যার প্রসারে এবং নানাবিধ কার্যনির্বাহের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত হবেন। পাশ্চাত্য থেকে পাওয়া জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ যাতে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ঠিকভাবে পান সেদিকে বিদ্যাসাগর বিশেষ মনোযোগ দেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে বারানসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইন সাহেব যে রিপোর্ট দেন তার ওপর মন্তব্যে বিদ্যাসাগরের সেই দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ব্যালান্টাইন রিপোর্টের প্রতিক্রিয়ায় বিদ্যাসাগর সোজাসুজি বলেন যে বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো যায় না। আর জোর করে সামঞ্জস্য তৈরির চেষ্টাও বাঞ্ছনীয় নয়। এই প্রসঙ্গে দেশীয় পন্ডিতদের বহুকালের সঞ্চিত দৃঢ়মূল কুসংস্কারগুলির কঠোর সমালোচনা করেন বিদ্যাসাগর। তাঁর মতে সাংখ্য বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন হলেও, উন্নত সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনে এবং সুদীর্ঘ পরম্পরার স্বীকৃতিতে ছাত্ররা তা পড়বেন। আবার বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে সম্যক দৃষ্টিকোণ এবং জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনে পাশচাত্যের বাস্তবনিষ্ঠ দর্শন ছাত্রদের পড়া প্রয়োজন। ব্যালানটাইন-এর প্রস্তাবিত বিশপ বার্কলের Inquiry গ্রন্থটি সে দিক থেকে নেহাৎ অনুপযুক্ত। প্রয়োজন সাংখ্য ও বেদান্তের যেখানে ভ্রান্তি তার প্রতিষেধক পাশ্চাত্য দর্শনের অধ্যয়ন। বার্কলের বইটি প্রতিষেধক নয়, বরং সাংখ্য বেদান্তের পরিপূরক। এই প্রসঙ্গে মিলের লজিকের কোনো সংক্ষিপ্তসার নয়, মূল বইটি ছাত্ররা পড়বেন বলে বিদ্যাসাগর জোর দেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময়ে বিদ্যাসাগর বাংলা প্রাথমিক স্কুলের বিস্তারে

উদ্যোগী হয়েছিলেন। বহুদিন অবহেলার পর উনিশ শতকের মাঝামাঝি প্রাথমিক শিক্ষার দুরবস্থা দূর করতে সরকারি মহলে কিছু নড়াচড়া দেখা যায়। বিদ্যাসাগরের তৈরি স্মারকলিপির ভিত্তিতে রচিত একটি প্রতিবেদন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর হ্যালিডে কর্তৃপক্ষকে পাঠান। অধিকর্তার অধীনে নতুন ব্যবস্থায় হ্যালিডের উৎসাহ ও সমর্থনে বিদ্যাসাগর কয়েকটি জেলার সহকারি স্কুল পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত হন। জেলায় জেলায় ঘুরে তিনি প্রতি সার্কেলে একটি মডেল স্কুলের স্থান নির্বাচন করেন এবং শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর জন্য কলকাতার সংস্কৃত কলেজে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। এভাবে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি দু-দিকেই নজর পড়ে। জায়গায় জায়গায় স্কুলগৃহ নির্মাণে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতা ও অর্থসাহায্য অর্জনেও সফল হন বিদ্যাসাগর। কলকাতায় মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগর বেথুনের সহযোগী ছিলেন। হ্যালিডের সমর্থন ও উৎসাহে জেলা স্তরেও কয়েকটি মেয়েদের স্কুল শুরু করে দেন বিদ্যাসাগর। তার জন্য অগ্রিম সরকারি অনুমোদন নেওয়া হয়নি। শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং মেয়েদের স্কুলগুলিকে অর্থ সাহায্য দিতে আপত্তি করেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক নিয়োগে এবং শিক্ষার নানা স্তরে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে বিদ্যাসাগরের প্রভাব খর্ব করতে চান অধিকর্তা। এমন সব বিরোধিতা ও অসম্মানের কারণে ১৮৫৮ তে দুটি সরকারি চাকরিতেই (সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং সহকারী স্কুল পরিদর্শক) ইস্তফা দিলেন বিদ্যাসাগর।

বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের বিরাট অবদানের মধ্যে তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অক্ষর পরিচয় থেকে নীতিগল্প, সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে বাংলার ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ে বাল্য এবং কিশোর শিক্ষার স্তরে স্তরে উদ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক রচনায় তাঁর উৎকর্ষ এখনও আমাদের কাছে এক মহৎ সঞ্চয়ের অভিজ্ঞতা। আর সংস্কৃত ও শেকসপীয়র থেকে বিদ্যাসাগরের অনুবাদ, প্রায়ই ভাবানুবাদ, সাহিত্যগুণে বিশিষ্ট। শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনের সৌকর্যে বিদ্যাসাগরের রচনা বাংলা গদ্যকে ছন্দস্রোত আর ধ্বনিসামঞ্জস্যে মন্ডিত সৌন্দর্য এবং পরিপূর্ণতা দান করে। তাই বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিধবাবিবাহ আর বহুবিবাহ প্রসঙ্গে তর্কবিতর্কেও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি তেমন গদ্যে রচিত সমসাময়িক আখ্যানের জোরে বিদ্যাসাগর আপন মীমাংসাকে প্রত্যক্ষ বাস্তবের আবেদনে গ্রথিত করেন। বইয়ের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর শুধু লেখক নন। অন্য এক পরিপূরক ভূমিকায় তিনি তো বাংলার নবজাগরণে এক বিশিষ্ট সঙ্গতির দৃষ্টান্ত রাখলেন। জীবনের আটত্রিশ বছরেই তাঁর চাকরি থেকে জীবিকা অর্জন শেষ হলো। রসময় দত্তের সঙ্গে মতভেদের দরুন প্রথমবার সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি বলেছিলেন প্রয়োজনে 'আলুপটল বেচে খাব!' আলুপটল নয়, বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় তিনি পুস্তক প্রকাশনার ব্যবসা শুরু করেন। গোড়াতে ধার করে নিজেরা ছাপাখানাও স্থাপন করেন। গর্ডন ইয়ং - এর ব্যবহারে উত্যক্ত বিদ্যাসাগর পদত্যাগের পর পুস্তক রচনা ও প্রকাশনায় জীবিকার উপায় খুঁজলেন। নিজে গ্রন্থ রচনা, অন্য লেখক নির্বাচন, ছাপাখানার

উন্নতি, বাংলা হরফের সংস্কার, গোটা উদ্যোগের তত্ত্বাবধান আর পরিচালনা, তার মুনাফা থেকেই আবার প্রকাশনার আয়তনবৃদ্ধি সব মিলিয়ে বিদ্যাসাগরের এই কীর্তির কোনো তুলনা মেলা কঠিন। ব্যবসা তিনি ব্যবসার নিয়মেই করতেন। এর থেকে তখনকার দিনে তাঁর মাসিক আয় চার হাজার টাকা পেরিয়ে যায়। আটত্রিশ বছর বয়স থেকে এটাই ছিল তাঁর মূল জীবিকা। গুরুভার সব সাংসারিক দায়িত্ব, পিতামাতার সন্তুষ্টি বিধান, সমাজ সংস্কার ও বহুজনের বিপদ আপদ প্রয়োজনে অকুণ্ঠ দান — এসব কর্তব্যপালনে বিদ্যাসাগর উপার্জনের ওই উৎসেই নির্ভর করতেন।

মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের কথা না বললে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের একটি বড় কীর্তির কথা বাদ পড়বে। 'হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন' থেকে কলেজ স্তরের বিদ্যায়তনে রূপান্তরের অনেক বাধা ছিল। তখন তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে অনেক সাহেবের সমাবেশ। ইংরেজের শিক্ষকতা ও তত্ত্বাবধান ছাড়া কলেজ স্তরে ইংরেজি শিক্ষা অসম্ভব বলে সাহেবরা মনে করতেন। একাধিক বার আবেদনের পর মেট্রোপলিটন উচ্চশিক্ষা দানের অনুমোদন পায়। ১৮৭২ এ এফ.এ.(ফার্স্ট আর্টস) এবং আরও সাত বছর পরে স্নাতক স্তরে (বি.এ.) পরীক্ষার জন্য শিক্ষাদান অনুমোদিত হয়। শিক্ষক নির্বাচন, উঁচু মানের সুশৃঙ্খল লেখাপড়া, লাইব্রেরিতে যথোপযুক্ত সংগ্রহ ইত্যাদি প্রতিটি দরকারি ব্যাপারে নিরন্তর অক্লান্ত অভিনিবেশ বিদ্যাসাগরের ছিল। পরীক্ষার ফল নিয়মিত সাফল্যে চিহ্নিত হতো। এভাবে অস্বচ্ছল গরিব ভদ্রলোকদের কাছে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এনে দিলেন বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরেজি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন'।

সমাজের পরিব্যাপ্ত ভালমন্দ মিলিয়েই তেমন বদ্ধমূল রোপণের তাৎপর্য। সংস্কৃত কলেজের পুনর্বিন্যাস, তার পাঠক্রমের রূপান্তর, মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সব ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর এক অভিন্ন উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হন। মেকলের শিক্ষানীতিতে এবং তার আনুষঙ্গিক কর্মক্ষেত্রে চাকরি ও পেশার যে নতুন সুযোগ বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে এল, বিদ্যাসাগর তার আয়ত্তি কেবল ধনাঢ্য ভদ্রলোকের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। তাই নিছক সনাতন পান্ডিত্যের পরিবর্তে তিনি সংস্কৃত কলেজকে কালোপযোগী বিদ্যাশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে আগ্রহী। তেমন শিক্ষায় ছাত্ররা প্রাচ্য বিদ্যার বিশারদ অথবা 'অ্যাঙ্গলিসিস্ট' পন্ডিতদের অপেক্ষা বেশি যোগ্য হবেন। সেরকম শিক্ষিত সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদে নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে আবেদনও করেছিলেন বিদ্যাসাগর। অপেক্ষাকৃত অল্প আয়ের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের জন্য সুলভ উচ্চশিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান মেট্রোপলিটন কলেজ গড়ে তোলেন বিদ্যাসাগর। বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে তার উদ্যেগের প্রধান লক্ষ্য ছিল জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ছাপোষা গৃহস্থ আর দরিদ্র ভদ্রলোক। শিক্ষাখাতে তখনকার সরকারি ব্যয় ও ব্যবস্থার কথা বিচার করে ভদ্রেতর বৃহত্তর জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অবাস্তব মনে করতেন বিদ্যাসাগর।

ভারতীয় ও ইউরোপীয় চিন্তার মধ্যে কোনো না কোনো সমন্বয়ের প্রয়াসে সেদিনের অনেক বাঙালি মনীষী নিবিষ্ট হন। তেমন এক দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাসৌধের নির্মাণ বিদ্যাসাগরকে আকর্ষণ করেনি। দিনানুদৈনিক বাস্তবিক সমস্যার মোকাবিলাকেই জীবনের ব্রত ভাবতেন বিদ্যাসাগর। ব্যালান্টাইন রিপোর্টের প্রতিক্রিয়ায় তো তিনি খোলাখুলি লেখেন যে বিজ্ঞান এবং হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনচিন্তার মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো সম্ভব নয়। আর মিল না থাকলেও নতুন শিক্ষার কার্যক্রমে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ইংরেজি বিদ্যাকে প্রাধান্য দিতে বিদ্যাসাগর দ্বিধা করেন নি। আবার সমাজ সংস্কারের ন্যায্যতা প্রদর্শনে তিনি কিন্তু শাস্ত্রীয় অনুমোদনের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেন। মেয়েদের সহবাস সম্মতির ন্যূনতম বয়স বারো বছর স্থির করতে যে আইন ১৮৯১-তে গৃহীত হয়, সে সম্পর্কে সরকার থেকে বিদ্যাসাগরের মত চাওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে রোগশয্যা থেকে বিদ্যাসাগর জানান যে ধর্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট গর্ভাধান বিধি অমান্য করে কোনো আইন প্রণয়নে তাঁর সমর্থন নেই। উল্লেখযোগ্য যে নিজের কোনো কন্যার বিয়ে তাদের বারো বছরের কমে বিদ্যাসাগর দেননি।

সঙ্গতি অসঙ্গতির গোটা চেহারা সমাজ অর্থনীতির ব্যাপক অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে চেনা যায় না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জের ধরে জমিদারি যথেচ্ছাচার ভয়ানক হয়। কৃষকের ওপর বিপুল খাজনা ও সুদের বোঝা চাপে। কৃষিতে আর্থিক উদ্বৃত্তের (economic surplus) বিরাট অংশ জমিদার, তার নিম্নস্থ মধ্যস্বত্বের সুদীর্ঘ শৃঙ্খল এবং মহাজনদের করায়ত্ত ছিল। এদের মতিগতিতে কৃষিতে বিনিয়োগের ঝোঁক ছিল না বললেই হয়। ১৮৫০-এর পর বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট বড় কৃষক বিদ্রোহও ঘটে যায়। ১৮৮৫-র প্রজাস্বত্ব আইনে যদিবা জমিদারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ এবং রায়ত প্রজার অধিকার নিরাপদ করবার সরকারি উদ্যোগ দেখা গেল, ইতিমধ্যে উত্তরোত্তর জটিলতায় আকীর্ণ কৃষিব্যবস্থায় তার সুফল অবস্থাপন্ন দখলদার রায়তের (occupancy ryot) মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পুরো শতাব্দী ব্যেপে বড় একটা জনসংখ্যাবৃদ্ধি না হলেও বিকল্প জীবিকার অভাবে কৃষির ওপর লোকের চাপ বেড়ে চলছিল। দখলদার রায়তদের মধ্যেও খাজনাবিলির প্রবণতা দেখা দিলে কোর্ফা, উঠবন্দি, আধিয়ার, বর্গাদার প্রভৃতি নানারকম অরক্ষিত চাষির সংখ্যা বাড়তে থাকে। অরক্ষিত, কারণ তাদের যদৃচ্ছ খাজনাবৃদ্ধি এবং জমি থেকে উৎখাত হওয়ার কোনো বাধা আইনে ছিল না। বড়, মাঝারি, ছোট কৃষকের কমবেশি জমির অধিকার মতো তাদের মধ্যে বিভেদীকরণের প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে যায় রায়তি স্বত্ব এবং প্রকৃত কৃষিকর্মের মধ্যে এই ব্যবধান। অরক্ষিত চাষি অবশ্য জমিদার ও তার নিম্নস্থ মধ্যস্বত্বাধিকারীদের এক্তিয়ারেও ছিল। কৃষকদের দূরস্থ বৃত্তি ও পেশায় যুক্ত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকও ভূস্বত্ব থেকে খাজনা ভোগে আগ্রহী হন। প্রজাস্বত্ব আইনের আগেপড়ে নানা নথিপত্রে, সমীক্ষায়, প্রতিবেদনে, তৎকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য ও মন্তব্যে কৃষিব্যবস্থার এমন চিত্র প্রকট হয়। সেখানে কৃষি উৎপাদনের উন্নতি সুদূরপরাহত বলার যথেষ্ট যুক্তি আছে। বিদ্যাসাগরের মতো অবস্থাপন্ন বাঙালি ভদ্রলোকের

পক্ষে সেদিন কৃষিজমির কোনো না কোনো স্তরে খাজনাভোগী মালিকানা ছিল খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বর্ধমানের মহারাজা দিতে চাইলেও বিদ্যাসাগর জমিতে মধ্যস্বত্ব গ্রহণে রাজি হন নি।

কৃষিজমির ওপর অতিরিক্ত চাপের সঙ্গে জড়িত উনিশ শতকের বাংলায় অবশিল্পায়নের (de-industrialisation) দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে (১৮০০-৩৩) এদেশ থেকে ব্রিটেনে সুতো ও সুতো বস্ত্রের রপ্তানি কমে যায়। মাঞ্চেস্টারে মসলিন উৎপাদন শুরু হলে ঢাকার উৎপাদন বেশ মার খায়। শিল্পবিপ্লবের আগে পরে ব্রিটেনে অবাধ বাণিজ্য নীতিকে সেদেশের স্বার্থে প্রয়োগের তৎপরতা লক্ষ্যণীয়। ১৮৩২-এ বিলেতের কর্তৃপক্ষকে প্রেরিত বার্তায় গভর্নর জেনারেল জানান যে বহুকাল ধরে ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পদ্রব্য বলে গণ্য সুতিবস্ত্র চিরতরে হারিয়ে গেল মনে হচ্ছে। রেশম, চিনি, নুন, সোরা সবক্ষেত্রেই উৎপাদন কমে যায়। চাহিদার অভাব ছিল মূল কারণ। ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজের ব্যবহার নিষিদ্ধ হলে এদেশে জাহাজ নির্মাণেরও আর ভবিষ্যৎ থাকে না।

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে জড়িত অবশিল্পায়নের দ্বিতীয় পর্ব। কলে তৈরি সস্তা বস্ত্র এদেশের বাজার অনেকখানি গ্রাস করে। কলকাতা বন্দরে বিলিতি সুতিবস্ত্রের আমদানি চারগুণ বেড়ে যায়। ১৯০১-এর সেন্সাস রিপোর্টে কামার, ছুতোর, কুমোর, চর্মকার ইত্যাদি অনেক কারিগরি বৃত্তিতে ঘোরতর দুর্দশার কথা আছে। অন্যপক্ষে চটের মতো বিদেশী পুঁজিপ্রধান রপ্তানিনির্ভর শিল্পের কোনো ব্যাপক কার্যফল ছিল না। আবার কৃষিজ পাটের উৎসেই তো চটকলের বৈশিষ্ট্য। সংগঠিত ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের রায়ত বা মাঝারি কৃষকদের মধ্যে বেশ সম্পন্ন এবং শেয়ানা লোকজন ছাড়া পাটের বাজারের ওঠানামার সঙ্গে মোকাবিলার সামর্থ্য অন্য চাষিদের ছিল না। নীলচাষের ক্ষেত্রে চাষির কাছে দাবিদাওয়া উসুল করতে প্রত্যক্ষ আধিপত্য আর এমনকী শারীরিক অত্যাচারের যে ভূমিকা ছিল, পাট কেনাবেচায় চাষির অচেনা বাজারের দোলাচল তার জায়গায় সক্রিয় হতো। সস্তায় জমি, শ্রম, কাঁচা মাল লাগিয়ে বিদেশী পুঁজির মুনাফা অর্জনের উপায়মাত্র হয়ে পড়ে বাংলায় উনিশ শতকের চটকল, চা-বাগিচা এবং খনিজ উৎপাদন। কৃষি ও কারিগরি অর্থনীতির বিপর্যয়ে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যে লাভ যাই হক, পুরো অর্থনীতির কোনো উপকার নেই। তাই কলকাতা হয়ে পড়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনাবর্জিত ঔপনিবেশিক শোষণের স্নায়ুকেন্দ্র। একই কারণে কলকাতার বাইরে সারা প্রদেশে উৎপাদন-কেন্দ্রিক বর্ধিষ্ণু শহরের প্রতিষ্ঠাও কোনো জমি খুঁজে পায় না।

এমন পটভূমিতে বছর চল্লিশের মধ্যে মেকলের পরিপ্রেক্ষিতে কঠিন সংকটের ছায়া পড়ল। ১৮৭০-এর শিক্ষা কমিশন মন্তব্য করে যে চাকরি বাবদ পদের পরিমাণ ধরলে ইংরেজি শিক্ষিতের জোগান দ্রুত তা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তখন বলা হলো কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ঘটলে শিক্ষিতরা কাজের অনটনে এত ভুগবেন না। ১৮৮০-র দশক এবং তারপরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ানিরিং, চিকিৎসা বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা কোনো বিষয়ে শিক্ষিত

হয়েই বড় একটা কাজের সুযোগ নেই। 'সাধারণী' 'সোমপ্রকাশ' সমেত তৎকালীন বহু পত্রপত্রিকায় এই সংকট সম্পর্কে অনেক তথ্য এবং মন্তব্য চোখে পড়ে।

মেকলের শিক্ষানীতিতে যেন বাঙালির কাজকর্মের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রতিশ্রুতি ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ও তার আনুষঙ্গিক কাজকর্মে ইংরেজি শিক্ষিত দেশীয় লোকের আবশ্যকতা থেকে সে নীতির প্রবর্তন। এতে মধ্যবিত্ত অনেক মানুষের উৎসাহ অস্বাভাবিক নয়। তাই সামর্থ্যের অতীত করে ইংরেজি শিক্ষার জন্য দৌড় লেগে গেল। একদিকে উচ্চ নিদেনপক্ষে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রচন্ড আগ্রহ এবং তার ফলে তেমন শিক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি। অন্যদিকে কিন্তু ঔপনিবেশিক সমাজ অর্থনীতির মন্থর গতিতে কর্মের বৈচিত্র্য ও প্রসারের পরিমাণ পিছিয়ে পড়ে। এমন ব্যবধানেই শতাব্দীর শেষ দু-তিন দশক ধরে বাঙালি মধ্যবিত্তের সংকট বাড়তে থাকে। ব্যাপারটা কিন্তু নিছক অর্থনীতিতে নির্ধারিত বাকি জীবনের সমস্যা নয়। ভাবমন্ডলেও ভিড় করে আসে দেশীবিদেশী চিন্তার গ্রহণবর্জনে হরেকরকম দোলাচল, পদে পদে উলটোবাঁকের টানাপড়েন। শাসক শাসিতের বৈষম্য নিয়ে মনঃকষ্ট জাতীয়তাবাদের উন্মেষকে সমানে প্ররোচনা দেয়। নানা স্তরে তার দৃষ্টান্তের শেষ নাই। ইলবার্ট বিলের ঝামেলা অনেকেই জানেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র বা আই.সি.এস. রমেশচন্দ্রের সরকারি চাকরির অভিজ্ঞতাও সে দিক থেকে আদৌ গ্লানিমুক্ত ছিল না। বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত ঋণে জর্জরিত বিদ্যাসাগর একবার লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিডন্-কে চাকরির জন্য আবেদন করতে বাধ্য হন। তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিয়োগ করবার কথা বিডন্ ভাবলেও, ইউরোপীয় অধ্যাপকদের চেয়ে কম মাইনেতে কাজ করতে সম্মত না হওয়ায় বিদ্যাসাগরের চাকরি হয়নি।

১৮৯১-তে একাত্তর বছর বয়সে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু। শেষ জীবনে তিনি বড়ই নিঃসঙ্গ, নানা উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় তিক্ত, আশাহত। নিজের পঞ্চাশ বছরেরও আগে থেকে তেমন বিরূপ অভিজ্ঞতার আরম্ভ। দেশের লোকের অসার অপদার্থতায় তিনি কত বিড়ম্বিত সে কথা আগে বলেছি। ১৮৭৬-এ ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন-এর সংস্থাপনায় যে বিদ্যাসাগরের কাছে প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাওয়া যায়নি, তার কথা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'-এ আমরা পাই, আর জীবনের অন্তিম পাঁচ ছয় বছরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও কাজকর্ম সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কোনো উৎসাহ ছিল না। বরং তার 'এলিটিস্ট' গঠন ও হালচাল নিয়ে বিদ্যাসাগরের বিরূপ মন্তব্য ও সমালোচনার কথাই আমরা জানি। গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র আপন সংসারকে তুষ্ট করতে সদাসচেষ্ট ছিলেন। মাতাপিতার সম্বন্ধে তাঁর ভক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার কথা তো বাঙালি গার্হস্থ্যের পরম্পরায় প্রায় যেন কিংবদন্তির মতো সঞ্চিত হয়ে আছে। সস্নেহ প্রয়াস, প্রচুর অর্থব্যয় সত্ত্বেও ভাইদের খুশি করতে পারেননি। একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র 'যারপরনাই যেথচ্ছচারী ও কুপথগামী' হওয়ায় তার 'সংস্রব ও সম্পর্ক' ত্যাগ করেন বিদ্যাসাগর। ঘরেবাইরে অনেক ব্যর্থতা বিড়ম্বনায় নাজেহাল বিদ্যাসাগর প্রায়ই সাঁওতাল অধ্যুষিত কর্মাটাঁড়ে চলে যেতেন। সেখানে তিনি একটি ছোট বাংলো বাড়ি কেনেন। সাঁওতালদের সান্নিধ্যে, তাঁদের সরল আচরণে

বিদ্যাসাগর স্বস্তি পান। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জানাশোনা এবং অভ্যাস তাঁর ছিল। চিকিৎসকের গুণেও তিনি সাঁওতালদের প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠেন। খবর পেলে মাইলের পর মাইল হেঁটে গিয়ে রোগী দেখে ওযুধ দিতেন বিদ্যাসাগর। সাঁওতালদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের স্নিগ্ধ সম্পর্ক নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি নানা আবেদনে বিশিষ্ট লেখা আছে। ১৮৭৮-এ কর্মাটাড়ে গিয়ে শাস্ত্রীমশাই যা দেখেন তার বিবরণ।

সেবার কর্মাটাড়ে বিদ্যাসাগরের কথায় উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কিছু মন্তব্যও শোনেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অনেকের সঙ্গে বিদ্যাসাগরেরও হাতে তৈরি ওই উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত। এক গুলিখোরের বয়ান ধরে বিদ্যাসাগরের সেই গল্প! শাস্ত্রীমশাইয়ের অন্য একটি লেখা থেকে তার সারার্থ বলছি, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, এক পাকের তৈয়ারি কিনা, তাই সব স্বাদ একই রকম। তেমনি সব বাঙালিরই জীবন চরিত একই রকম, সেই পাঠশালা, সেই ইস্কুল, সেই কলেজ, সেই ইউনিভার্সিটি, সেই মাস্টারি, কেরাণিগিরি উকিলি বা ডাক্তারি, সেই বিবাহ, সেই ছেলে পিলে, সেই সাহেব, সেই আপিস। সবই এক রকম। এক পাকের তৈয়ারি কিনা, তাই স্বাদ একই রূপ!' অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের বিফল প্রকল্প বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়! একটি প্রামাণিক রিপোর্টের ভাষায় সেখানে ছাত্রদের ধুলোর ওপর আঁচড় কেটে অক্ষর চিনতে হয়!

রবীন্দ্রনাথের কথায় কোনো ভুল নেই যে বঙ্গদেশে বিদ্যাসাগর একক ছিলেন। বহু গুণের আকর, সর্বদা পরহিতে নিবিষ্ট, নির্ভীক, নির্লোভ মানুষটির কোনো তুলনা মেলা সত্যি কঠিন। তবু সমাজ সংসারে কত কী বিরূপ অভিজ্ঞতায় তিনি পর্যুদস্ত হলেন তার হদিস পাওয়ার কিছু চেষ্টা এতক্ষণ করলাম। তখন মনে হয় ইউরোপীয় ভাববিশ্বের যে অভ্যার্থনায় চিহ্নিত বাংলায় উনিশ শতকের নবজাগরণ তার আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে ব্রিটিশ আধিপত্যের জোর জুলুম, শাসন শোষণের কঠোর বাস্তব। ওই ইতিহাসে মুখ আর মুখোশের ছড়াছড়িতে কোনো শেষ নেই। তাইতো আজও আমরা উত্তর-ঔপনিবেশিক মোট বহর বইতে বইতে কুল পাই না। এসব ভেবেই বলব বিদ্যাসাগরকে বিগ্রহ বানিয়ে ফুলপাতা দেওয়া নিরর্থক। আবার তাঁর মূর্তি ভেঙে বিপ্লবের ঢাক বাজানো উন্মাদের লক্ষণ। উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত বাস্তবের অবহেলায় একটা প্রতীকের নেশা কাজ করছে। তেমন মায়াজালের আচ্ছন্নতা কাটালেই বিদ্যাসাগরের যথার্থ পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা আমরা করতে পারি।

কয়েকটি বই ঃ-

1. ইন্দ্র মিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর।*
2. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ।*
3. Sumit Sarkar, 'Vidyasagar and Brahmanical Society' in *Writing Social History*.
4. স্বপন বসু, সমকালে বিদ্যাসাগর
5. অশোক সেন, *কথায় উপকথায় বিদ্যাসাগর।*
6. Asok Sen, *Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones*.

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থাবলী

সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা ঃ

অশীন দাশগুপ্ত ঃ আরব সাগর ১৫০০-১৮০০ (১৯৯৬)

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ সাম্রাজ্যের বাকী ইতিহাস (১৯৯৭)

গৌতম চট্টোপাধ্যায় ঃ সর্বহারা বিপ্লবের জয়শঙ্খ (১৯৯৮)

গৌতম ভদ্র ঃ উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন (১৯৯৯)

সব্যসাচী ভট্টাচার্য ঃ দারিদ্রচিন্তা ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে তিনটি ধারা (২০০০)

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঃ মহাশান্তির পরে বিশ্ব (২০০১)

মালিনী ভট্টাচার্য ঃ পরাধীনের রোমান্টিকতা ও যুগসন্ধির রবীন্দ্রনাথ (২০০২)

অশীন দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা

ইরফান হাবিব ঃ মুঘল সাম্রাজ্য ও তার পতন (১৯৯৯)

অম্লান দত্ত ঃ গান্ধী ও ইতিহাস চিন্তা (২০০০)

সুমিত সরকার ঃ জাতীয়তাবাদ ছাড়িয়ে : স্বদেশী যুগোত্তর বাংলার কয়েকটি দিক (২০০১)